বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বিম্বিত বাঙালী মানস

নাভিদ সালেহ্

কাল- আবর্তনের বাস্তবতা, প্রজ্ঞা, আর বোধনকে বিম্বিত করবার সাধনায় ব্যাকুল আমরা জন্ম দিয়েছি নূতন থেকে নূতনতর প্রকাশ মাধ্যমের। পরিপার্শ্বের প্রতিকৃতি- হৃদ্ধ আদিম গুহাচিত্র থেকে আজকের ত্রি- মাত্রিক চলমান- চিত্র পর্যন্ত, প্রতিটি প্রয়াসই আপন- জাগানিয়া অনিবার্য আত্মপ্রকাশ। হাজার বছরে পাল্টেছে কেবল ভঙ্গিমা; অন্তর বাজানোর আকুতি নবাগত ঢঙে সময়কে চিত্রন করেছে 'অমরত্বের প্রত্যাশায়'। আমাদের চলচ্চিত্রও তাই সময়ের স্বাক্ষী, বিবর্তনের সন্তান। প্রতিটি চলচ্চিত্র তার ঘটনাসূত্র, দৃশ্যায়ন, আর গানে বলছে সময়ের কথা, পরিচয় দিচ্ছে সামাজিক মানসের।

বাঙালী স্বত্তার পরিচয় যেমন চর্যাপদে, পনের শতকের কবিগানে, আর রবীন্দ্রনাথের জীবন-ঘনিষ্ঠ রোমান্টিকতায়, তেমনি বাঙলার চলচ্চিত্রে চিত্রিত হয়েছে দৈনন্দিন টানাপোড়েন। এ উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জন্ম হয় মানিকগঞ্জের হীরালাল সেনের হাত ধরে ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী' ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ। আমাদের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠার সময়পট বিভাজনের আর সংগ্রামের; ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ বিভাজন এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ প্রভাবিত করেছে আমাদের মানস আর তাই অনিবার্যভাবে চলচ্চিত্রকে। এ বিভাজন একদিকে যেমন কঠোর করেছে চলচ্চিত্র বিকাশের পথ, অন্যদিকে সংগ্রামের প্রেক্ষাপট পরিশুদ্ধি দিয়েছে চলচ্চিত্র স্বত্তার। প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণকে যদি উন্নতির সূচক ধরি তবে ১৯১৪ সালের আরমেনিয়ান স্ট্রীটের 'পিকচার হাউজ'এর প্রতিষ্ঠা তার প্রথম উপাত্ত বিন্দু। দর্শক চাহিদার ক্রমশ বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা দেয় 'রূপমহল', 'লায়ন সিনেমা', আর 'আজাদ সিনেমা' নামের প্রেক্ষাগৃহগুলোর। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিকাশের অবকাঠামো নির্মিত হতে থাকে এভাবেই। তবে একথা বলা জরুরী যে মেধা কিংবা অবকাঠামোগত ভিত্তি থাকা সত্তেও পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রের সাথে পেরে উঠছিল না এপার বাংলার চলচ্চিত্র। স্বপ্নের জুটি উত্তম- সুচিত্রার জনপ্রিয়তা বাঙালী মধ্যবিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সীমানাগত এ প্রতিযোগিতার ওপর যোগ হয় পশ্চিম পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক শোষন। চলচ্চিত্র নির্মাণের ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পি,এফ,ডি,সি,- র প্রতিষ্ঠা অবকাঠামোগত প্রবৃদ্ধি দেয় উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রে। এক থেকে একশ' একাশি- তে পৌঁছতে উর্দু চলচ্চিত্রের সময় লেগেছে ন' বছর ('৪৮- '৫৬)। অথচ প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র 'শেষ চুম্বন' নির্মিত হবার পর এ ন' বছরে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে জোটে কেবল 'মুখ ও মুখোশ'। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে যখন ভেসে যেতে শুরু করে পাকিস্তানী শোষনের দেয়াল, বঙ্গবন্ধু তখন '৫৭- তে প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন এফ,ডি,সি, বিল। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পাশ হওয়ার পর

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি। চলচ্চিত্রের এ উত্থানে ক'জন গুণী মানুষের নাম না নিলেই নয়। খান আতাউর রাহমান, নাজীর আহমেদ খান, আব্দুল জব্বার খান, ফতেহ লোহানী, মহিউদ্দীন, এহতেশাম, গাজী মাজহারুল আনোয়ার প্রমুখ সাহসী আর বুদ্ধিদীপ্ত ক'জন মুখের প্রানান্ত প্রচেষ্টার ফসল আমাদের আজকের চলচ্চিত্র।

এ উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে গানের উপস্থিতি এবং প্রভাব প্রগাঢ়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে গান যেন প্রাণবায়ু। প্রাচীন ধর্মচর্চায় ভজনের সুরে ঈশ্বর-বন্দনা, মধ্যযুগের স্বভাব কবিদের গীতিকাব্য, আর পঞ্চকবির গভীর দার্শনিক-ভাবপূর্ণ গানে বাঙালী মানস যেন মত্ত। চলচ্চিত্রেও তাই গানের মাধ্যমে ভাবানুভূতির প্রকাশ কখনওই জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়। প্রাচ্যের দার্শনিক ভাবনা আর সাহিত্য চর্চাকে যখন প্রতীচ্যের সমালচকরা অতি-রোমান্টিক বলে আখ্যা দেয় তখন লালনের দেহবাদ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনঘন রোমান্টিকতাকে প্রচ্ছন্নভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। এডওয়ার্ড সাঈদ-এর 'ওরিয়েন্টালিজম' তাই প্রাচ্যের দর্শন বাস্তবতাকে বিম্বিত করবার জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান তাই একান্তভাবে জীবনের কথা বলে, প্রান্তিক চাষীর বাঁচবার আকুতির কথা বলে, বলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের মায়ের আর্তনাদের কথা। আমাদের চলচ্চিত্রের গানে জীবন-বোধ চিত্রায়নের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানার সমালোচকদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী অভিক্ষান। এর সমান্তরালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-বিরাগী বুদ্ধিজীবি সমাজের উপেক্ষা, প্রতীচ্যের সাথে এ বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে আমাদের পরাজয়ই ডেকে এনেছে।

চলচ্চিত্র আর তার গানে সময়ের প্রভাব কিভাবে পড়েছে তা আমাদের ব্যক্তি-মানস পর্যালোচনায় ফুটে ওঠে। শোষিত সমাজে অভাব-তাড়িত মানুষ আশ্রয় খোঁজে মিসটিসিজম-এ, লোক-কথায়। '৪৮-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানী শোষনে ক্লান্ত বাংলার মানুষও যন্ত্রনা ভুলে ছিল সালাহ্উদ্দিনের 'রূপবান', জহির রায়হানের 'বেহুলা, দীলিপ সোমের 'সাত-ভাই-চম্পা',আর খান আতা'র 'অরুন-বরুণ-কিরণমালা'-র লোকায়ত কাহিনীতে। সংগ্রাম যখন মূর্ত হয়, যুদ্ধ যখন হয় অনিবার্য তখন চলচ্চিত্রে যেন 'মিছিলে মিছিলে হয় কথোপকথন'। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যেন ইন্ধন যোগায় খান আতা'র 'সিরাজউদ্দৌলা' নির্মাণে আর আসন্ন মুক্তিযুদ্ধকে সামনে রেখে জহির রায়হান রেখে যান 'জীবন থেকে নেয়া'। 'ওরা এগার জন', 'তিতুমীর', 'অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'-এর মত চলচ্চিত্র এ-পার বাংলার পরিচালকদের মেধা আর মননের স্বাক্ষর-ই নয় বরং চিরাচরিত অতি-রোমান্তিকতার অভিযোগের ভীত ভাঙবার অনুষঙ্গ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জীবন-ঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাণ সময়ের প্রয়োজনে জন্ম দেয় অসাধারণ কিছু চলচ্চিত্রের। একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পরিশুদ্ধ চলচ্চিত্র 'একাত্তরের যীশু', 'আগুনের পরশমণি', আর 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' যুদ্ধের ঘটনা চীত্রন করে নিরপেক্ষ নিপুণতায়, তেমনি যুদ্ধ-বিধ্বস্থ মানস থেকে বেরিয়ে এসে দৈনন্দিন টানাপোড়েনকে নির্মাতারা ফুটিয়ে তোলেন 'শঙ্খনীল কারাগার', চাপা ডাঙার বউ', 'মাটির ময়না', 'শ্যামল ছায়া', 'সূর্য দীঘল বাড়ি', 'সুপ্রাভাত', 'সীমানা পেরিয়ে', 'সারেং

বউ', 'পদ্মা নদীর মাঝি'-তে। ভাবনাগত এ উত্তরনকে সহজেই তুলনা করা যায় দান্তের 'ইনফারনো'-র দার্শনিক চিন্তনের সাথে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম যেন দার্শনিক ভাবনাকে পরিশুদ্ধ করেছে ইনফারনোর আগুণে গা-ঘষটে। এ পরিশুদ্ধি খান আতা', হুমায়ুন আহমেদ, আর এহতেশামকে যেন পৌঁছে দিয়েছে 'পারগেটরী'-র দরজায়। সময়ের এমন নিরপেক্ষ বীক্ষন আর কোন সংস্কৃতির ভাগ্যে জুটেছে বলে মনে হয় না।

আমাদের চলচ্চিত্রের পূর্ণাঙ্গতা কেবল সময় আঙ্গিক থেকে নয় বরং তার ব্যপ্তীতেও। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেই চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শরৎচন্দ্রের ক্ল্যাসিকগুলো। শরৎচন্দ্রের দেবদাসের অবিকৃত আর নিখুঁত চিত্রায়ন এপাড় বাংলাতেও হয়েছে; অনাড়ম্বর হতে পারে তবে কাহিনী চিত্রনে নির্ভুল। শিশুতোষ চলচ্চিত্রে গোটা ভারতবর্ষই ততটা মনোযোগী নয়। তবুও '৮০-র দশকে মুক্তি পাওয়া বাদল রহমানের 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' ও আজিজুর রহমানের 'ছুটির ঘন্টা' গোটা বাংলার শিশুদের প্রাণের খোরাক হয়ে রয়েছে। তারই পথ ধরে আমরা পেয়েছি সি,বি, জামানের 'পুরষ্কার' ছবিটি। এ পূর্ণতার স্বাক্ষর আমাদের মত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য একটি অর্জন বইকি। চিন্তাগত এ বিস্তার আর নির্মাণগত ক্রোমোন্নয়ন থাকা স্বত্তেও আমাদের চলচিত্র যেন মধ্যবিত্ত সুশীল সমাজের জন্য নয়। জীবন-ঘনিষ্ঠ রুচিশীল ছবি যেমন কেবল শিক্ষিত সমাজের মনের খোরাক তেমনি বাণিজ্যিক ছবিগুলো কেবলেই যেন সাধারণ, শেকড়-ঘেষা গণমানুষের জন্য দর্শনীয়। বৌদ্ধিক সমাজের কাছে তা যেন অচ্ছুৎ। চলচ্চিত্রের এ শ্রেণী বিভাজন মূল শিল্প আর সাহিত্যধারা থেকে একে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। নির্মাতারা মন দিয়েছেন ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রে। গ্রামের আটপৌরে সাধারণ দর্শক আটকে গেছে 'রংবাজ' আর 'বেদের মেয়ে জোছনা'-র মত ফ্যান্টাসী-ভিত্তিক চলচ্চিত্রের চক্রে।

আমাদের চলচ্চিত্র আর তার গানের মূল্যমান ধরে রাখবার জন্য বুদ্ধিজীবি সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা অনিবার্য। এ অবধি চলচ্চিত্র বিকাশের ওপর গবেষণা অতি সীমিত। এ বৈরাগ্যের অবসান একান্ত জরুরী। জীবন-ঘনিষ্ঠ এ দৈনন্দিন চলমান-চিত্রের কদর না হলে এর নিম্নগামী প্রতীপগতি রোধ অসম্ভব হয়ে দাড়াঁবে।